

ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা

গৌতম বসু

ভাষায় ও চিন্তায় বাংলা কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে তাঁর সমসাময়িক কবিরা সার্থক, এ-বিবেচনা যদি নিভুল হয় তবে উৎপলকুমার বসুর কবিতার অবস্থান কোথায়? কী কারণে তাঁর কবিতা পাঠিত হচ্ছে আজ, পাঠিত হবে ভবিষ্যতে? একটি বালিকা ধারাপাত বিক্রি করতে করতে এসে পড়েছে শ্মশানে, অথচ আশ্চর্য, শায়িত মৃতদেহটিকে নিরঙ্কর জ্ঞান করেছে— উৎপলকুমারের এ উদ্বেগ কি সঙ্গারিত হল বাংলা কবিতায়? যেসব শ্রীলোক রণভূমি অতিক্রম করে যেতে চেয়েছিলেন একদা, প্রহরীর নিঃশর্ত অনুমতি তাঁরা পেলেন কি? আজ মনে হয় এইরকম অজস্র প্রশ্নের আড়ালে সম্পূর্ণ নতুন একটি কাব্যভাবনা নীরবে এখনও অপেক্ষমান। এর সঙ্গে বর্তমান কবিতাপাঠকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে অথচ, যে-অভিজ্ঞতার প্রাথমিক বিস্ময়বোধ এ-পাঠক এতদিনে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, এমন কথা নিঃস্বাধ্য বলা যাবে না। কবিতা কী হয়ে উঠতে পারে, কতদূর যেতে পারে, কেমন উড়তে পারে আরও, তারই সন্বেদন

যেন গাচ্ছত রয়েছে উৎপলকুমার বসুর রচনায়। তাঁর কবিতার নানা প্রান্ত ও গুণের কথা আলোচিত হতে শব্দনেছি বহুবার, সেই সূত্র অনুসরণ করে মনে হয় তাঁর লেখার সমস্ত লক্ষণের নিচে একটি গুণ তাঁকে সতত কর্মক্ষম রেখেছে, শব্দ বিশেষতা নয়, তাঁকে একাকীত্বও দিয়েছে—পূর্বজ্ঞানক্ষমতা। এই কারণে, স্বল্পায়ু কবিতার জগতে ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’-র যে কোনো পৃষ্ঠা আজও স্মরণযোগ্য। ‘দূর থেকে হাত তোলো, যদি পারো জানাও সম্মতি / না হ’লে সশ্কেত আজও বৃথা যায়’—ঠিক এইরকম একটি মন্ত্রস্বরের জন্য বাংলা কবিতা প্রস্তুত ছিল না। আনন্দের কথা, অপ্রতিরোধ্য স্বরটি চিনে নিতে, গ্রহণ করতে বাংলা কবিতা স্বেচ্ছাবোধ করেনি। আজকের নবীনতম পাঠকের দৃষ্টিতে উৎপলকুমারের কৃতিত্ব তত প্রকট নয় কারণ তাঁর কাজের অনেকটাই বাংলা কবিতার মূলদেহে দ্রবীভূত হয়ে গেছে, তিনি যে-সম্ভাবনার দিকগাুলি একদা খুলে দিয়েছিলেন সেগাুলির কিছু-কিছু অবলম্বন করে স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে বিগত ত্রিশ বছরের কাব্যসাহিত্য, মনে হচ্ছে, নিত্যসঙ্গী এইসব কবিতা বৃষ্টি চিরকাল আমাদের সঙ্গেই ছিল। বস্তুত, এটিই যে কোনো কবিতার উৎকর্ষের শেষতম পরীক্ষা; যে কবিতা আলাদা হয়েই রইল, আরও পাঁচটি তুণের মতো তুণ হয়ে উঠতে পারল না, মিশে যেতে, হারিয়ে যেতে পারল না মানদ্বয়ের দীর্ঘায়ু ভাষা আন্দোলনে, সে কবিতা, আমরা জানি, মৃত। একটি কবিতা কবে নতুন ছিল, কবে থেকে সে প্রাচীন হতে শিখল—এ প্রশ্নের সদত্তর হয়ত নেই, অথচ, এইখানেই লুকিয়ে রয়েছে তার প্রাণদ্রমর।

কথাগাুলি এই কারণে উঠছে যে উৎপলকুমার বসুর কবিতা এখন সেই সন্ধিক্ষণে উপনীত যেখান থেকে তাকে রূপান্তরিত হতে হবে পুরাতনে। আমরা যারা তাঁর সমসাময়িক নই, ‘চৈত্রে রচিত কবিতা’ অথবা ‘পূরী সিরিজ’ কেউ-কেউ হয়তো ছুঁয়ে দেখতে পেরেছি মাত্র, মূখে-মুখে শিখে নিতে হয়েছে তাঁর কবিতা, পরে বিশ্ববাণী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে ফিরে পেয়েছি স্বপ্নোন্মিত সেই সকল অত্যাশ্চর্য পংক্তিমালা, তারাই উৎপলকুমারের কবিতার পরিণতির প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী। স্বীকার করতে স্বেচ্ছা নেই, আমাদের সময়ের অনেকের লেখা তাঁর কবিতা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সূত্র ধরে কাজ করার চেষ্টা করেছে আমরা অনেকেই, প্রত্যেকেই তাঁর কবিতার ভয়ংকর সম্মোহনক্ষমতা থেকে নিজেদের লেখা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

দুই

ভাষা, অনেক ক্ষেত্রে, মনের ভাব, যতটা প্রকাশ করে, গোপন করতে পারে তার চেয়ে বেশি; প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের পরিবর্তে বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে ভাষা একটি সাক্ষাতিক বাতরির রূপ গ্রহণ করে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায় এই মাত্রা অপূর্ণ না হলেও সন্দেহ নেই এর সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ আমরা দেখি কবিতায়। ভাষার এই সশ্কেত-

ধর্ম, বলা বাহুল্য, একদিনে অথবা কোনো দৃষ্টার একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেন ; এর অন্তরালে রয়েছে দীর্ঘ বিবর্তনের, সামাজিক নিপীড়নের, রাজভয়ের, লোকভয়ের ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবন্ধনের কাহিনী। আমরা যাকে বাংলাভাষার আদিকবিতা বলে মানি সেই চর্যাপদেই রয়েছে সেই গুঢ়লেখের অভিজ্ঞান, কিন্তু এমন মনে করা ভুল হবে যে সর্বত্র, সর্বকালে কবিরা এই সঙ্কেচনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সম্প্রসারণ অথবা সঙ্কেচন, উভয়ই সমাজে কবির অবস্থানের উপর প্রধানত নির্ভর করে ; এমনকি, প্রাস্তুদৃষ্টির চরিত্রলক্ষণ একই সময়ে একই ভাষায় প্রকাশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। একটি উদাহরণ হয়তো অসংগত হবে না— রামমোহন রায় ও লালন শাহ ফকির প্রায় একই সময়ে, একই ভাষায় গীত রচনা করেছেন অথচ তাঁরা সর্ব অর্থে দুই ভিন্ন পৃথিবীর অধিবাসী। রামমোহনের প্রয়োজন ছিল সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের, তাঁর ভাষাও সেইমতো গড়ে উঠেছে। অন্যপ্রান্তে লালন শাহের অবস্থান যেখানে সেখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের তীর ও নিষ্ঠুর শাসন সর্বব্যাপী ; আমরা অনুমান করতে পারি, পরিচাণ পাবার আশায় লালন একটি ব্যক্তিগত ভুবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁর ভাষাও সেই প্রয়াস ও সার্থকতার সাক্ষ্য বহন করে। অন্য পাঁচটি বাউলগীতের পাশে লালন শাহের কাজ রাখলে অন্তত দুটি কথা উঠে আসে ; এক, বাউলসাহিত্যের অনেকটাই নিছক অনুকরণের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং দুই, বহু রচনাই তত্ত্বের ভায়ে অবহ। বস্তুত, লালন শাহকে একাধারে একজন মৌলিক ভাবদ্রক ও প্রধান কবি রূপে স্বীকার করার ভিস্তি আমার মনে হয় এই যে, তত্ত্বের দাস তিনি নন, তাঁর রচনা, শেষ পর্যন্ত, তত্ত্বভারমুক্ত নিরুপম লিরিক। এখানে আমরা হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে উপনীত হয়েছি। সামাজিক অবস্থানের কারণে যাকে গুঢ়চারী হতে হল, ভাষা দিয়ে বাধ্যত আড়াল করে রাখতে হল কান্নাহাসি, ভাষা তাঁকে শৃঙ্খলিত নিরাপত্তারই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ব্যবহারের এই স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে ভাষায় সঙ্কেতময়তার গুণকে যিনি শিল্পের স্তরে তুলে আনতে পারেন, যার হস্তক্ষেপে উপযোগিতার মাত্রাস্তর সম্ভব, তাঁর কীর্তি বারংবার স্মরণযোগ্য। সঙ্কেতের প্রয়োগ আত্মরক্ষার প্রয়োজনবোধে আবিস্কৃত একটি পদ্ধতিমাত্র, তাকে লালন শাহ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন তত্ত্বের ভার থেকে মুক্তির এক উপায় রূপে— বিশেষ অর্থে সাক্ষাতক ভাষার ব্যবহারে এবং সাধারণভাবে কবিতার ইতিহাসে এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত।

সঙ্কেত প্রয়োগের তাৎপর্য ও সম্ভাবনা বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা এতক্ষণ একটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেছি ; ভিন্ন পরিবেশ থেকে গৃহীত আরও একটি দৃষ্টান্ত এবার দেখা যেতে পারে। জার্মানি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরেও, নাৎসি বাহিনী থেকে রক্ষা পাবার জন্য কুর্ট শ্মুইটসকে ইয়োরোপের নানা দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। অবশেষে নাৎসি বাহিনী কবলিত নরওয়ে থেকে জলপথে তিনি পৌঁছিলেন স্কটল্যান্ডে, কিন্তু জন্মসূত্রে জার্মান হওয়ার কারণে ইংরেজ বাহিনীর হাতে তাঁকে বন্দী হতে হল। অজ্ঞাতপরিচয় সেই মানুষ্যটি তাঁর স্বদেশ থেকে বাস্তবর্তি কোলাজ সামগ্রী ব্যতীত

কিছুই আনেননি, সেগদুলি পোস্টারের ছেঁড়া অংশ অথবা ক্লোকরুমের টিকিটের চেয়ে বিপজ্জনক কিছু নয়, ইংরেজ সেনা ক্রমে তাঁকে কিছুটা প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করলেন। এই পরিবেশে এবং মুক্ত হওয়ার পর, শূন্যটিস' যখন তাঁর জীবনের অন্তিমপর্বের কোলাজগুলির কাজে ব্যাপৃত, তখন তিনি নিশ্চয় অনুমান করতে পেয়েছিলেন যে, এইভাবে কাজ করতে-করতে সকলের অজ্ঞাতে একদিন তাঁর মৃত্যু হবে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান চিত্রীদের মধ্যে শূন্যটিসের স্থান আজ তর্কাতীত; সাস্কাতিক ভাষায় গঠিত শিল্পকর্ম যে কোন স্তরে পৌঁছতে সক্ষম তা, তার কাজের মধ্যে আমরা আরও একবার প্রত্যক্ষ করি। ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আনা কাগজের টুকরো সাজিয়ে কী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন শূন্যটিস? তাঁর দশদিকে অস্থিপঞ্জরের, পরিভ্রমণ মূল্য-বোধের স্তূপ, প্রাণের পন্দনটুকুও যেন রুদ্ধ— এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, পুনর্গঠন অন্তত তাঁর পক্ষে দুরূহ সাধনা ছিল সন্দেহ নেই। সমস্ত দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করে সেকাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন শূন্যটিস; তাঁর ভাষায় 'এন্ড থিং হ্যাড ব্রোকেন ডাউন ইন এনি কেস, অ্যান্ড নিউ থিংস হ্যাড টু বি মেড আউট অফ ফ্রাগমেন্টস'।

তিনি

দীর্ঘ এই অবতারণার কারণ অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। বাংলা কবিতার পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন যে উৎপলকুমার বসু'র কবিতাও প্রবলভাবে সাস্কাতিক গুণে আক্রান্ত। তাঁর ভাষায় প্রবেশাধিকার অর্জন করতে না পারলে, তাঁর সংশয় ও উদ্বেগের অংশীদার না হতে পারলে, বারংবার পাঠেও কবিতার মর্মার্থ অনায়াসে থেকে যাবে। এই কারণবশত, তাঁর পাঠক সংখ্যা বহু হলেও অগণিত নয় এবং যা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের কথা, এই কারণে তাঁর কবিতার পংক্তি বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে, এই দৃশ্য থেকে পরিগ্রহ পেয়েছি। এই আলোচনায় আমরা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র প্রযোজ্য কোনো নিয়ম নেই; সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দুটি সূত্র পেয়েছি, এক, সঙ্কেত ব্যবহারের সঙ্গে সংকটমোচনের একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং দুই, সংকটমোচনের প্রসঙ্গটি প্রাথমিক স্তরের, কবিতায় একটি উত্তরণের সম্ভাবনা যদি না থাকে তবে তার আয়তকাল খর্ব হতে বাধ্য। এই কথাগুলি উৎপলকুমার বসু'র কবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তৎক্ষণাৎ দুটি গভীরতর চিন্তা আমাদের ভাবিত করে এক, কোন সংকটের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল এবং দুই, কোন উত্তরণের সম্ভাবনা আমরা পাই তাঁর লেখায়?

প্রথম প্রশ্নটির সদুত্তর নির্দিষ্ট করা সহজ নয় মানি, তবু মনে হয় উৎপলকুমার বসু ও তাঁর সতীর্থদের ক্ষেত্রে এটি ছিল আত্মপ্রকাশের সংকট। তাঁদের সময়ের পূর্ববর্তী এক শত বছরের পরিসরে বাংলা কবিতা ও সাধারণভাবে বিশ্বসাহিত্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে তা বিস্মৃত হবার সুযোগ নেই। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো তরুণ লেখকের আত্মপ্রকাশের সমস্যাকে নূনুস্তান করবারও কোনো উপায়

নেই। কোন্ পথে হাঁটবেন তিনি? সমস্ত জমি কর্ণিত, সব চিন্তা কবিতায় আকার-গ্রহণ করেছে, এমনকি অন্য এক কবির পংক্তি উদ্ধার করে বলা যেতে পারে, ‘সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা’—এই পরিস্থিতিতে একটি ব্যক্তিগত ভাষার, একটি ‘ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা’র নিরন্তর সম্মান ব্যতীত তরুণ লেখকের সম্মুখে অন্য কোনো পথ খোলা নেই। বলা নিঃপ্রয়োজন, এই প্রক্রিয়াটি লেখকের জীবনে আত্মশয় কষ্টকর একটি অধ্যায়, কিছু কবিতায় তার ক্ষতিচিহ্ন রয়ে গেলেও, সাধারণভাবে কেউ কোনোদিন লেখকের এই কৃচ্ছসাধনের কথা বিশদ জানতে পারেন না। এইজন্য, লেখকের পদক্ষেপ যখন সত্যিই পাঠকমহলে ঘোষিত হয় তখন তা একই সঙ্গে অপত্যাগিত ও বিস্ময়কর। উৎপলকুমারের কবিতা প্রসঙ্গে পাঠকের বিস্ময়বোধ আজও অক্ষত কারণ তাঁর প্রস্তুতিপর্ব রহস্যাবৃত; প্রথম থেকেই তাঁর লেখায় যেমন একটি পরিণত মনের পরিচয় পাই, তেমনই অন্ধকারে রয়েছে তাঁর কবিতার পূর্বসূত্র। বস্তুত, বিভিন্ন উৎস থেকে তরুণ এসে মিশে গিয়েছে তাঁর লেখায় যে কোনো একটি বা দুটি উৎস শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। প্রসঙ্গত, আজ তাঁকে প্রকৃত অর্থে এক মৌলিক কবির মর্যাদা দেওয়া হয় এই শর্ত মেনে নিয়েই যে তাঁর কবিতা শুদ্ধমাত্র অভিনব নয়, বাংলা কবিতার অভিজ্ঞতায়, নতুন।

একজন কবির কষ্টের ও আত্মখননের কথা শেষ পর্যন্ত কেউ মনে রাখে না, শুদ্ধমাত্র একটিই প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে; বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে কবিতা মুক্ত হতে পারল কি না, কবির তমসাবৃত জীবন ছেড়ে সে কি উড়ে যেতে পারল অন্তরীক্ষে? পুরী সিরিজের কিছু কবিতা এমনই, মনে হয় এরা যেন জীবনকে খুব কাছ থেকে ছুঁয়ে রয়েছে অথচ যেন বাঁধা পড়েনি কোথাও, যেন এরা কারুর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, উদ্ভিদের মতো যেন আপনিই গজিয়ে উঠেছে। একেই উত্তরণ বলব কি? যে অর্থে পাখি মরণশীল কিন্তু পাখির ডাক অমর, সে অর্থে এইসব কবিতা লেখকের জীবন ছেড়ে, ছায়া হয়ে সতত ফিরছে কি? একান্তই ব্যক্তিগত অনুভব এটি, প্রমাণাদি পেশে অক্ষম, তবু বলতে ইচ্ছা হয় উৎপলকুমার বসু অনাগতকালের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন, কয়েক ক্ষেত্রে কবিতাগুণি যেন তাঁকেও প্রত্যাখ্যান করে চলে যেতে চেয়েছে নিরুদ্দেশে, না হলে কেন তাঁকে নিজেরই কবিতার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কেনই বা শেষ কবিতায় এসে প্রকৃতির ভিতর হারিয়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা? কোনো এক গুণীজন বলেছিলেন, সত্য, এই পৃথিবী আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি কিন্তু তার চেয়েও গভীর কথা এই যে, ভাবীকালের হাত থেকে পাওয়া এক কর্জ এই পৃথিবী; উৎপলকুমার বসুর কিছু কবিতা পড়ে বোঝা যায় এটি অতি মূল্যবান এক উক্তি। □